ISSN: 2321- 8959

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৫ | সেপ্টেম্বর ২০২২

থিয়েটার দুনিয়া

THEATRE DUNIA - IN SEARCH OF THEATRE

বিশেষ সংখ্যা

বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ১৫০

সম্পাদক

দানী কর্মকার

ISSN 2321-8959

International Bilingual Theatre Magazine

ভিন্ন নাট্যভাষার খোঁজে একটি নাট্য পত্রিকা

থিয়েটার দুনিয়া

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৫ | সেপ্টেম্বর ২০২২

শারদীয়া সংখ্যা

THEATRE DUNIA – IN SEARCH OF THEATRE

Vol. – 10 Issue – 5

ISSN: 2321-8959

সম্পাদক • দানী কর্মকার

থিয়েটার দুনিয়া

রবীন্দ্রনগর নাট্যায়ুধ

থিয়েটার দুনিয়া

Theatre Dunia

Volume – 10 • Issue – 5 • September 2022

Editor-in-Chief
Dani Karmakar

Chief Advisory Council
Dr. Partha Pratim Panja, Dr. Apurba Dey

Editorial Board
Amit Sarkar, Samir Karmakar, Biswajit Pramanik,
Barnali Karmakar, Jhuma Ghosh, Loknath Saha

Published by
Dani Karmakar
on behalf of Theatre Dunia
In association with Rabindra Nagar Natyaayudh

Composed by Rajdeep Saha

Contact
Dani Karmakar
Editor-in-Chief
3, West Rabindra Nagar, Dum Dum Cantonment,
Kolkata – 700065, West Bengal, India
Email: theatredunia2013@gmail.com
Mobile: 9874053622, 9331834142

ISSN: 2321-8959

Price: Rs. 300.00(INR) $ 3.77 (USD)

© Copyright Reserved with Theatre Dunia, 2022

The opinion of the published work is the author's own.

All rights reserved. No part of this book magazine may be reproduced or used in any manner without the prior written permission of the publisher, except for the use of brief quotations in review.

বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৫ | সেপ্টেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

থিয়েটার দুনিয়া

নাটক

ভালবাসার ইস্কুল	দেবাশিস	১১৩
অন্তর্ঘাত	দেবরাজ ভট্টাচার্য	১৫৬
সাগরদার ক্লাস	সুভাষ কর্মকার	১৭০
এটা কোনো নাটক নয়	দেবরাজ ভট্টাচার্য	১৯০

অন্তর্দেশীয় প্রবন্ধ

আমাদের নাট্যতত্ত্বের শিকড়বাকড়	ড. শুভ জোয়ারদার	২০৭
বার্নার্ড শ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা	ড. মানস মুখোপাধ্যায়	২৩০
‘নেকড়ে’ হতে বাধ্য করে একদল বুভুক্ষু মানুষ	ড. আশিস রায়	২৩৬
জেলার থিয়েটার—সমস্যা ও সম্ভাবনা	তপন চক্রবর্তী	২৪৬
সাইট স্পেসিফিক থিয়েটারের নবজন্ম না পুনরুত্থান	সমুদ্রনীল সরকার	২৫৬

নাট্য আলোচনা ও সংবাদ

২৬২

'নেকড়ে' হতে বাধ্য করে একদল বুভুক্ষু মানুষ

ড. আশিস রায়

জানি চাহিদা আর ক্ষিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা সময়ে ক্ষিদে মিটে যায় কিন্তু শত চেষ্টা করলেও চাহিদা মেটে না। আর লোভী মানুষের চাহিদা তো আরো মেটে না। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। দেখেছি রক্তকরবী নাটকে রাজার চাহিদারো অন্ত ছিল না। তাল তাল সোনা জমানোর নেশা। 'নেকড়ে' নাটকের কংসারিও সোনা এবং সম্পত্তির পাগল। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষের এই মানসিক বিকলতা কেনো তৈরি হল? আর কবেই বা হোল? একটি সামজ বা রাষ্ট্র যখন তৈরি হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে শোষিত শ্রেণিও তৈরি হয়ে যায়। রাজা, ইংরেজ, জমিদার এদের মধ্যে এক শ্রেণির শাসক সাধারণ মানুষকে শোষণ করেছে। মার্কস, এঙ্গেলস শোষক শ্রেণিকে একটি নামে চিহ্নিত করেছেন। বুর্জোয়া। বুর্জোয়া শ্রেণি যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃ-তান্ত্রিক, প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষে মানুষের বন্ধন নষ্ট করে দিয়েছে। পারিবারিক সম্বন্ধকে এরা নামিয়ে এনেছে অর্থের সম্পর্কে। গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়ারা আরো সর্বনাশ করে দিয়েছে। শহরের থেকেও খারাপ। গ্রাম্য সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অথবা বিপদে ফেলে তাদের থেকে সর্বস্ব হরণ করে

Dr. Ashis Roy is a Assistant Professor at Department of Bengali in University of North Bengal.

তাদেরকে করে দিয়েছে অসহায়। অসহায় মানুষরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছে, কিন্তু পাল্টা মার দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছে অনেক পরে। মনোজ মিত্রের 'নেকড়ে' নাটকে আছে তারই প্রতিচ্ছবি। তবে মনোজ মিত্র কেনো এই ধরণের নাটক লিখেছেন? আসা যাক সেই প্রসঙ্গে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মনোজ মিত্র যখন নাটক লিখছেন তখন নাট্যজগতে দুই প্রবল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্ত। প্রথমজন তাঁর কজে প্রাধান্য দিচ্ছেন অনুভূতিকে আর অন্যজন বক্তব্যকে। তবে মনোজ মিত্র তাঁর নাটকের মধ্যে এই দুটি ধারাকে মিলিয়ে দিলেন। কুমার রায় তাঁর নাটকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন- *'স্বাধীনতার পর যে নতুন ভাবনা, যে নতুন দায়িত্ববোধ, যে নতুন উত্তেজনা—তখন তাঁর অবসান ঘটেছে। রাজনৈতিক আকাশ সমাকীর্ণ নানান সুবিধাবাদের জঞ্জালে। মানুষের বাঁচার সমস্যা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অনুভূতিশীল আধুনিক মানুষের অসহায় এবং নিঃসঙ্গ আর্তি ফুটে উঠেছে তখন ধনবাদী সভ্যতার ব্যাধি নিয়ে। সে এক ক্ষুব্ধ-অস্থির উৎকেন্দ্রিক সময়। যে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা মানুষের মুক্তি দিতে পারে—সেই বিশ্বাসের আধারে বেনোজল ঢুকে পড়েছে—বিশ্বাস টুকরো হয়ে গেছে। ... প্রথম যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি আন্দোলন পর পর দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ... এরই মধ্যে সত্তর দশকের টালমাটাল অবস্থা, জরুরী অবস্থা, মৃত্যু, বিভীষিকা, বামফ্রন্টের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, শাসন ও রাজত্বকাল। এই সময়কালে মনোজ মিত্র নাটক লিখছেন।*[১] সামাজিক অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে। চারপাশের যে পরিস্থিতি তিনি দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন তা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। তাঁর নাটকে আছে ক্ষুধা, অস্তিত্বের সংকট, বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, ভালোবাসা। সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর চোখে দেখা। তাঁর নাটকের মধ্যে রাজনীতির যোগ তেমন নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক বোধ ছিল। তিনি বলছেন— *'আমি যখন নাটক করতে আসি তখন আমার সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম না। ... তবে হ্যাঁ, একথা তো ঠিক আজকে আমার একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে। আমার নাটকেও তা প্রতিফলিত হয়। ... আমি নিজে রাজনীতির সঙ্গে যতটা যুক্ত, আমার*

নাটকও রাজনীতির সঙ্গে ঠিক ততটাই যুক্ত। আমি রাজনীতি থেকে যতখানি দূরে, আমার নাটকও ঠিক ততখানিই দূরে। তবে এটাতো ঠিকই, একজন মানুষ যখন নাটক লিখবেন বা করবেন, তখন তার সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নাটকে প্রতিফলিত হবেই। সেটা সোচ্চারেই হোক কিংবা গোপনেই হোক।[২] মানুষকে তিনি এগুলির থেকে আলাদা করে দেখতে চাননি। সেজন্য তাঁর নাটকে কোন চাপিয়ে দেওয়া বক্তব্য নেই। নিজের অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। শৈবাল মিত্র 'আজকাল' পত্রিকায় মনোজ মিত্রকে নিয়ে লিখছেন—*দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তির সঙ্কট, অসহায়তায় তিনি অবিরত আলোড়িত, ব্যথিত হয়েছেন। জীবন কেন এত দুঃসময়, মানবিক সম্পর্কগুলো কেন ভেঙে পড়ছে, কোথায় চলেছে মানবসভ্যতা, অস্তিত্বে বিজড়িত এই মৌলিক দর্শকদের তিনি ভুলতে দেন নি।'* [৩] মনোজ মিত্র তাঁর প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর সহানুভূতি ছিল প্রবল। তাঁর নাটকের নায়কেরা সকলেই প্রায় নিম্নস্তরের মানুষ, সমাজে বিশেষভাবে তাদের কোন স্থান নেই। অশোক মুখোপাধ্যায় একজায়গায় বলছেন *'তাঁর রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার বা উপভোগের অফুরন্ত উপাদান। যে কোনও মানুষের মধ্যে, যে কোনও ঘটনার মধ্যে, যে কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল, মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধহয় ধরাই পড়ত না। কিন্তু শুধু রঙ্গ নয়।... কাছ থেকে দেখলে ধরা পড়বেই, মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালোবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা'* [৪] সেই দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় 'নেকড়ে' নাটকের মধ্যে। সর্বগ্রাসী মানুষদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর উপায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

'নেকড়ে' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় বহিরাগত কয়েকজন শোষকশ্রেণির নিপীড়নের কাহিনি এখানে বর্ণিত। এবং নাটকের শেষে শোষকশ্রেণিকে পর্যদুস্ত করে সাধারণ মানুষের জয় লাভ। নাটকটিতে প্রত্যক্ষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকলেও শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সমবেত লড়াই করার মনোভাব এবং নীহারির নেতৃত্বে জনতাকে একত্রিত করার প্রয়াস, সবটাই যেন এক বিশেষ মতাদর্শের

দ্বারা প্রভাবিত বলে অনুমান করা যায়।

নাটকের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে কংসারি একটু ভীতু হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ করেই তার মনে হচ্ছে চোখের সামনে একটা বিশাল দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে, তার দুটো লোমশ হাত কংসারির গলার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণীটির গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। আর চোখ দুটো গনগনে আগুনের মতো। সর্বশক্তি দিয়ে কংসারি চিৎকার দিয়ে ডাকছে অন্যদের। সকলেই হতভম্ব। কংসারি যেমন ভাবে প্রাণীটির বর্ণনা দিচ্ছেন, তারা কেউ খুঁজে সেই প্রাণীর হদিশ করতে পারলো না। কংসারি ভিতরে ভিতরে বেশ ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেনো? ভয় কেনো সে পাবে? যৌবন বয়সে কংসারি এসেছিল সুন্দরবনের এই বাদা অঞ্চলে। দ্বীপের অধিবাসীরা তখন আদিম জীবন যাপন করতো। পশু পাখি মেরে তারা খেত আর অজানা কোন এক জ্বরে তাদের মৃত্যু হত। সভ্য সমাজে মানুষ হওয়া কংসারির শয়তানি বুদ্ধি তাকে শান্ত থাকতে দিল না। এখানে বসবাস করে সে বিরাট এক ঐশ্বর্যের পাহাড় বানাবার স্বপ্ন দেখতে থাকল। ধীরে ধীরে সে ক্ষেতের পর ক্ষেত দখল করতে থাকল বিনা পয়সায় অথবা সামান্য অর্থের বিনিময়ে। ধান, কাঠ, মধুর ব্যবসা চলতে থাকল। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে জমতে থাকল সোনা। ঠকে যাওয়া মানুষগুলো একটা সময় বুঝতে পারলো, তাদের অর্জিত সম্পদ আজ অন্যের হাতে। সম্পদের উত্তরাধিকার কংসারি নয়, সুন্দরবনের আদিম মানুষের। লড়াইটা শুরু এখান থেকেই। সাধারণ মানুষদের জাগ্রত দেখে কংসারি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ সে দুঃস্বপ্ন দেখে।

> **কংসারি** ।। *(আস্তে আস্তে) কী দেখলাম! ... কখন... কোথায় ... (থেমে) তুমি ধান বেচা টাকা দিয়ে গেলে, আমি বিছানায় বসে গুনছি... আর বান্ডিল বাঁধছি... ঘড়িতে এগারোটা বাজলো... খোলা জানলা দিয়ে দেখি আকাশে সোনার থালার মতো চাঁদ... দেখতে দেখতে চোখ জড়িয়ে এল... তন্দ্রা মতো... তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ মনে হলো ...* [৫]

কংসারির চিৎকারে সকলে এসে হাজির হয়। কিন্তু কেউ কোন প্রাণী দেখতে পায় না। শশাঙ্ক বুঝতে পারে না এতবড়ো প্রাণী এত অল্প সময়ে কোথায় চলে

যেতে পারে। গোঁসাই বলে ওঠে ছোটবাবুর চিৎকারে প্রাণীটি বেশি দূরে যেতে পারেনি। খামারের মধ্যেই আছে। জনমজুরের চিৎকারে সে বেশি দূরে যেতে পারেনি। দ্বীপের চাষাভুষো এই মানুষগুলো ফসলের মরশুমে সারাদিন রাত এই ক্ষেতেই পড়ে থাকে কিন্তু তাদের কপালে জোটে খুব সামান্য পারিশ্রমিক। সেটাতেই তাদের মুখ বুজে থাকতে হয়। শশাঙ্ক এই প্রাণীর আগমণের কারণে একটু অবাক হয়ে যায়। কেননা কাকা কংসারির মুখে যেটা শুনেছে তার সঙ্গে এই দ্বীপের তেমন মিল সে পাচ্ছে না।

শশাঙ্ক ।। *কি করে ভাববো? তুমি তো চিরকাল বলে আসছো, তোমার এ দ্বীপ ঠাণ্ডা, শান্ত... পৃথিবী উল্টে গেলেও তোমার এখানে তাঁর ছায়াটি পড়বে না ... দৈত্যদানোর কথা জানাওনি তো কখনো!*

কংসারি ।। *আমিও জানতাম না! মাত্র ক'মাস আগেও এরকম নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা পৃথিবীতে দুটো ছিল না ... মানুষও বড় নিরীহ! চড় মারলেও, ঘুরে চড় মারে না!* [৬]

আসলে এই দ্বীপে চড় মারার মতো কেউ নেই। গোঁসাই সেটাই জানিয়ে দিয়েছে। এখানে আছে হাড় জিরজিরে নেংটিপরা চাঁড়াল পোদ জেলে। এরা আবার মানুষ নাকি, বিশেষ করে সমাজের উঁচু শ্রেণির কাছে। শোষিত হওয়া মানুষগুলি দীর্ঘ দিন না খেতে পেয়ে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। আক্রামের একটা লাঠির ঘায়ে এদের তিরিশ জন মারা যায়। স্বাভাবিক ছন্দে চলার মতো শক্তিও তাদের নেই। কিন্তু কয়েকমাস ধরে দ্বীপের মানুষগুলির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। সবটা শশাঙ্ক বুঝতে পারছে না। সে বহুবার কাকার কাছে জানতে চেয়েছিল এখানের খবর কিন্তু কংসারি তাকে কোন দিনই কিছু বলতে চায়নি। বিশ বছর ধরে কংসারি যে কি করেছে সে খবর সবার কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছে। হঠাৎ করেই কংসারি শশাঙ্ককে দ্বীপে ডেকে পাঠায় বিপদে পড়েছে জানিয়ে। এতদিন ধরে একটু একটু করে জমানো সমস্ত সম্পত্তি সে তার নিজের রক্তের কারোর কাছে দিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যে সম্পত্তি কংসারি হস্তগত করেছে সেই সম্পত্তি তো কংসারির নয়। এই সম্পত্তির মালিক এখানের আদিবাসীদের। কিন্তু সে সব কিছু কেড়ে

নিয়েছে। কংসারি সম্পত্তি দখলের গল্প করেছে শশাঙ্কের কাছে।

কংসারি ।। *কি করে করলুম! শশাঙ্ক, তোমার মতো বয়েসে আমি এই বাদা অঞ্চলে আসি। কয়েকটা নদী ডিঙিয়ে তবে এই দ্বীপ। দ্বীপের মানুষ যারা তারা ঐ ওরা ... মাছ ধরে ... পশু পাখি মেরে খায়। আর এক ধরণের বুনো জ্বরে পটাপট মারা যায়। - শশাঙ্ক, এই দ্বীপে পা দিয়ে আমি এক বিরাট ঐশ্বর্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখলুম! ... ধীরে ধীরে ঐ ক্ষেতের পর ক্ষেত দখল করে নিলুম ... বন জঙ্গল সাফ করে চাষ আবাদ শুরু করে দিলুম ... মাঠের পর মাঠে দেখলে আজ সোনালি ফসল!* [৭]

দখল করতে কংসারিকে বুদ্ধি ও লাঠির জোর দুটোই ব্যবহার করতে হয়েছিল। গোঁসাই আর আক্রম এই দুজন মানুষ তাঁর স্বপ্ন পূরণ করে দিয়েছিল। শুধু সম্পত্তি নয়, তার সঙ্গে সে অন্যের স্ত্রীকেও কেড়ে নিয়েছে। দ্বীপের সমস্ত কিছুর অধিপতি এখন কংসারি। অন্যের স্ত্রী নীহারিকে সে যখন গর্ভবতী করে ফেলে তখন এই গর্ভের সন্তানের জন্য নীহারি সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে দাবী করে। কংসারি বিষয়টি কোন মতেই মেনে নিতে পারে না। নীহারির মতো আদিবাসীদের কংসারি কোন দিন মানুষ বলে মেনে নিতে পারেনি তাদেরই কারোর গর্ভে নিজের সন্তান থাকলেও সে মানুষ বলে স্বীকার করতে পারবে না। আর সম্পত্তি দেবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। নীহারি যখন নিজের অবস্থান থেকে সরে আসে না তখন কংসারি নির্দয়ভাবে নীহারিকে বিষাক্ত বুনো পাতার রস খাইয়ে দেয়। গর্ভের সন্তান মারা যায় না, জন্ম নেয় বিকৃত এক আকার নিয়ে। জন্মের পরেই গোঁসাই সন্তানটিকে মারার জন্য নদীর ধারে নিয়ে যায় কিন্তু মারতে পারে না।

গোঁসাই ।। *আজ্ঞে জংগলে নিয়ে গিয়ে কাপড়টা সরিয়ে গলাটা টিপতে যাবো ... সর্বাঙ্গ থথর করে উঠলো আমার ... সাঁঝের আকাশটা তখন লাল... সেই আলোয়... উঃ অমন কুচ্ছিত কদাকার চেহারা কোন মানুষের পেটে জন্ম নেয়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না! আমি তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম ছোটবাবু!* [৮]

কয়েকমাস ধরে কংসারি এক অজানা ভয়ে ভীত হয়ে আছে। ছোট বাবুর দিকে যে মানুষরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পেত না। সেই ছোট বাবুর দুটো বুলডগ এবং পরবর্তীকালে আক্রমের রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়। তাদের ধারণা নীহারির পেটে জন্ম নেওয়া অদ্ভুত শিশুটি নেকড়ে হয়ে গিয়েছে সেই এই অত্যাচার করছে। নেকড়ের অত্যাচার বেড়েছে শশাঙ্কের দ্বীপে আসার পর থেকেই। কংসারি চেষ্টা করতে থাকে নেকড়েকে ধরার কিন্তু কোন ভাবেই তাকে ধরা যায় না। না ধরতে পারার রহস্যেরও কোন উন্মোচন হয় না। যেদিন নীহারি বাজনা বাজায় সেদিনেই নেকড়ের অত্যাচারের খবর পাওয়া যায়। অদ্ভুত এক আতঙ্কের পরিবেশের জন্য সন্ধ্যের পর আর কেউ বাড়ির বাইরে বার হয় না। নীহারি জানিয়ে দেয় গোঁসাই যেদিন তাঁর সন্তানকে ফেলে দিয়ে আসে জঙ্গলে, সে তখন জায়গাটা চিনে রেখে আসে। নোনাবিলে গিয়ে দেখে জ্যোছনার আলোয় ছেলের পাশে শুয়ে আছে এক নেকড়ে। নেকড়ে তাকে পালন করে বড় করে তুলেছে সেজন্য তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছে নেকড়ের মতো কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক হয়ে আছে মানুষের মতো। পশু শক্তির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে মানুষের বুদ্ধির। নীহারি তার অধিকার থেকে সরতে চায় না।

> **নীহারি** ।। *নরখাদক! নেকড়ে! ... (হেসে ওঠে) বাঘের কোলে আমার পুত্তুর বেড়ে উঠেছে! খাটবে ... আমার কথা খাটবে ... সে তোমার সম্পত্তি কামড়ে ছিঁড়ে নেবে!* [৯]

শশাঙ্ক নিজে শহরের ছেলে সে শহরের সখ আহ্লাদ ছেড়ে এই স্বজনহারা দ্বীপে থাকতে চায়নি। কিন্তু কিছু দিন না কাটতেই মোহে পড়েছে। এখন সে আর এখান থেকে যেতে চায় না। কংসারি যেমন যুবক বয়সে মদ আর মেয়েতে মজে ছিল ঠিক তেমনই শশাঙ্ক সুখীকে ভোগ করার নেশায় মেতে রইল। আর সম্পত্তি পাওয়ার লালসা। আদিবাসী মেয়ে শহরের লোকের ভালোবাসার ভানকে ধরতে পারেনি। সে নিজের ভালোবাসা হুক্কাকে ছেড়ে দাদাবাবুকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু যখন দেখল ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম নারী সঙ্গের জন্য ছটফট করছে তখন তাঁর প্রিয় দাদাবাবু ঘনশ্যামের কাছে পাঠাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেছে না। যারা এতদিন এইরকম দাসত্ব সহ্য করেছে সেই আদিবাসী মানুষরা কেমন যেন

বদলে যেতে থাকল। অবাক কংসারি। অবাক গোঁসাই। যাদের কে সে দেখেছে—

> **গোঁসাই** ।। *যতো হারামজাদার বংশ! সকালবেলা একখানা ক্ষুর দিয়ে মাথা চেঁচে দিলে দুপুরবেলা তেল মাখতে গিয়ে টের পাস তোরা ... এতকাল তাই দেখেছি আর আজ দাবী আদায় হচ্ছে! খামারে ঢোকার মুখে গাড়ি বাঁধলি* [১০]

সামান্য পেয়ে যারা খুশি থেকেছে তারা আজ নিজেদের পাওনার কথা বলে উঠেছে। আস্তে আস্তে প্রত্যেকেই দাবী জানতে থাকে। শশাঙ্ক ভয় দেখায় নীহারিকে দ্বীপ ছেড়ে না গেলে গুলি করার। নীহারিও জানিয়ে দেয় সে একটি জানোয়ারের মা অন্ধকারে একজোড়া থাবা বসালে তাঁর চোদ্দ পুরুষ কেউ খুঁজে পাবে না। কংসারি নিজের ঔরসজাত নেকড়েকে হত্যা করার জন্য দক্ষিণের বিলে গিয়ে মানুষের পায়ের ছাপ দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। নেকড়ে রহস্য সে ধরে ফেলেছে। নীহারির ছেলে যে বেঁচে নেই সেটা বুঝতে তাঁর আর অপেক্ষা করতে হয়নি। জন্মের পরেই সে মারা যায়। অবহেলিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষকে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং কংসারির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নেকড়ে হয়ে ওঠার গল্পকে সে ব্যবহার করেছে। দ্বীপের সম্পত্তি সে দ্বীপেই রাখতে চেয়েছে। যে সম্পত্তিতে যাদের ভোগের কোন অধিকার নেই তাদের কাছ থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের লড়াই করতে চেয়েছে নীহারি। প্রতাপশালী কংসারি যেমন ভয় পেয়েছে তেমনই শশাঙ্ক এবং সোনার ব্যবসায়ী ঘনশ্যামও শেষের দিকে সোনা কিনতে অস্বীকার করেছে। এতদিন কংসারির কু-কর্মের সঙ্গী গোঁসাই জানতো সোনার হাফ ভাগ তাকে দেওয়া হবে। সে যখন সোনার ভাগ পায়নি তখন সে নীহারির দলে এসে যোগদান করতে চেয়েছে। নীহারি তাকে দলে নিতে চায়নি। কেননা গোঁসাই শুধুমাত্র কংসারির কথায় গরীব মানুষগুলো চিৎ করে ফেলে লাথি মেরেছে, তাদের মুখের ভাত ফেলে দিয়ে পেতলের থালা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। তাকে সে ক্ষমা করবে কেমন করে। বাধ্য হয়ে গোঁসাইকেও হত্যা করে। শশাঙ্ক বুঝতে পারে এই সব কিছুর পিছনে আছে নীহারি। নীহারিকে সে গুলি করে মারতে চায়। কংসারির তাতে মত নেই। কোথাও যেন দুর্বলতা থেকে গিয়েছে নীহারির প্রতি। আর এই আদিবাসী মেয়েকে সে শত্রুর মর্যাদা দিতে চায় না। কংসারির সমস্ত ডানা ছাটা

হয়ে যাওয়ার পর নীহারি প্রস্তুত শেষ লড়াই করার জন্য। কংসারিও তৈরি মোকাবিলা করার জন্য। কংসারি জানে সম্পত্তি বিনিময় হওয়ার দিনেই আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য বাড়ির চারিদিকে জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে আর একটা বড়ো ঘন্টা বাঁধা আছে যাতে নেকড়ে জালে পড়লে সর্তক হওয়া যায়। কিন্তু নেকড়ে আসে না। আসে নীহারি। নীহারি সেজে এসেছে। কংসারি দেখে নীহারির কালো কপালে টকটকে আগুনের গোলা। পূর্বের ভালোবাসায় মত্ত হয়ে যায় কংসারি।

> **কংসারি** ।। *কেনো? আমাদের মতো বেয়াড়া শত্তুর, যারা একে আরেক জনের বুকের রক্ত ঝরাবে বলে তাক করছে-একটু অন্যমনস্ক হলেই মুহূর্তে টুঁটি টিপে ধরবে...তারাই কিনা...(নীহারিকে টেনে নিয়ে) পরস্পরের গায়ের গন্ধ শুষে নিচ্ছে-শরীরের তাপে শরীর শুকোচ্ছে! আরাম লাগছে আমার, দারুণ আরাম।* [১১]

নীহারি তাঁর শত্রু কিন্তু তারপরেও তাকে ছাড়তে পারছে না। চাঁদনি রাতে ধানক্ষেতে, মাঠে, শালচারার নীচে দুজনের উদ্দাম যৌবনের স্মৃতি সে তরিয়ে তরিয়ে উপভোগ করে। এরই মধ্যে নীহারি জানিয়ে দেয় তাঁর সন্তান আর বেঁচে নেই। তাকে এক্ষুণি মাটিতে পুঁতে রেখে এসেছে। এবং দুর্গন্ধযুক্ত মাথার চুলের গন্ধ শোকায়। কংসারির উল্লাসের আর সীমা থাকে না। তার মাঝে নীহারি বুকের মধ্য থেকে বাঘের থাবা বের করে নিয়েছে। কংসারির চোখে আঘাত করে। অন্ধ কংসারি নীহারিকে আঘাত করে। নেকড়ের মত দুজনেই পরস্পরের গলা চেপে ধরে। এই সময় শশাঙ্ক নীহারিকে গুলি মারে। গুলির আঘাতে নীহারি মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। ঘন্টার আওয়াজে ছুটে এসেছে শোষিত, অসহায় মানুষরা। তাদের কারো কাছে তীর ধনুক, গাছের ডাল পালা আবার বাঘের থাবা। কংসারি বুঝতে পারে নেকড়ে তাকে হত্যা করতে চায়নি চেয়েছে দ্বীপের না খেতে পাওয়া আধমরা মানুষগুলি। নেকড়েকে মারার জন্য যে জাল লাগানো হয়েছিল সেই জালেই আটকা পড়ে কংসারি, শশাঙ্ক এবং ঘনশ্যামের মত মানুষরা। মনোজ মিত্র রামায়ণের অনুষঙ্গ এনে কংসারিকে রাবণ-রাজা বলে উল্লেখ করেছেন। সীতার উপরে অত্যাচার করে ধ্বংস হয়েছিল রাবণ আর এখানে আদিবাসী নিরীহ নীহারির রোষের আগুনে পুড়ে মরেছে কংসারি ঠাকুর।

নাটকটি মূলত সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করার জন্য। যারা প্রতিক্ষণে শোষিত ও নির্যাতিত নানা দিক থেকে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যখনি তারা ব্যর্থ হয়েছে তখনই তারা শিক্ষা নিয়েছে আরো নিখুঁত পরিকল্পনা করার জন্য। ধানের গাড়ি আটকালে চাষিদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে কংসারি। তাই নীহারি এবার পরিকল্পনা নিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে সাবধানে পা ফেলার। প্রথমেই কংসারিকে সে দুর্বল করে দেয়। কংসারির দুটো বুলডগ, আক্রম, গোঁসাই সকলকে তারা হত্যা করে। কংসারি ভীতরে ভীতরে খুব ভীত হয়ে যায়। আর এই সুযোগেই নীহারি তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। যেদিন দ্বীপের সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হবে ঠিক হয় সেদিন সমস্ত শক্তি নিয়ে নীহারি অসহায় মানুষগুলোর বুকে সাহস জুগিয়ে লড়াইয়ের মাঠে অবতীর্ণ হয়। শশাঙ্কের গুলির আঘাতে নিজে মৃত্যুবরণ করলেও অত্যাচারীর পতন সম্ভব করে তোলে। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ে অসহায় মানুষের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১। কুমার রায়, মনোজের মনোভূমি, স্যাস ১৯৯০, পৃষ্ঠা – ৩৫৩-৩৫৪

২। মনোজ মিত্র, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা – ৬৫

৩। শৈবাল মিত্র, বিষ্ণুশর্মার মত দুর্যোগেও তাঁর স্মিত হাসি, আজকাল, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ ৯ আগস্ট।

৪। অশোক মুখোপাধ্যায়, মতান্তরকে শ্রদ্ধা করে, মনান্তর ঘটতে দেয় না, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ ৯ আগস্ট।

৫। মনোজ মিত্র, মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র, (দ্বিতীয় খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা – ১৪২

৬। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৩

৭। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৫০

৮। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৯

৯। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৫৩

১০। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৬৬

১১। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৯২